ইতিহাসে হাতেখড়ি

দেশের ভাষা

দেবারতি বাগচী

ছবি

রঞ্জিত চিত্রকর
সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশের ভাষা

লেখা – দেবারতি বাগচী

কলকাতা, অক্টোবর ২০২২

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশের ভাষা
কলকাতা, অক্টোবর ২০২২

লেখা – দেবারতি বাগচী
সম্পাদনা – অন্বেষা সেনগুপ্ত, দেবারতি বাগচী
ছবি– রঞ্জিত চিত্রকর, সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর
প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও পরিকল্পনা – ওয়াসিম হেলাল
মুদ্রণ – এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশক - ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা
ডিডি ২৭/ডি, সেক্টর ১, কলকাতা - ৭০০০৬৪
ওয়েবসাইট - www.idsk.in
ইমেইল - idsk@idskmail.com / office@idsk.edu.in

আর্থিক সহায়তা – রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, লিয়াসঁ অফিস, নয়া দিল্লী
সি -১৫, এস ডি এ মার্কেট, নয়া দিল্লী - ১১০০১৬
ওয়েবসাইট – https://www.rosalux.in
ইমেইল - south-asia@rosalux.org
এই বইটি শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/অসরকারি প্রতিষ্ঠান, নীতি নির্ধারক সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

This publication is sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with grants from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication.
The content of the publication is the sole responsibility of the partner and does not necessarily reflect a position of RLS.

সূচিপত্র

১। ভাষার সীমানা	০৭
২। ভাষার ছোট-বড়	১৩
৩। বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ	
(ক) বঙ্গভঙ্গ আর তার বিরুদ্ধে একজোট হওয়া	২১
(খ) বাংলার জন্য আলাদা দেশ	২৭
৪। ভাষাই বাঁধে, ভাষাই ভাঙে?	
(ক) ভাষার জন্য রাজ্য	৩৩
(খ) অসমে ভাষার লড়াই	৪০
৫। দেশ সকলের, তবু কেউ বাদ পড়ে কি?	৪৯

ইতিহাসে হাতেখড়ি : দেশের ভাষা

হাওড়া
ଭୁବନେଶ୍ୱର
తిరుపతి
ಯಶವಂತಪುರ
విజయవాడ

১। ভাষার সীমানা

ছোটবেলায় এক বার বেড়াতে গেছিলাম ব্যাঙ্গালোর, কর্নাটকের রাজধানী। এখন অবশ্য তার নাম বদলে গিয়েছে। ওখানকার মানুষ কন্নড় ভাষায় কথা বলেন, আর সেই ভাষার উচ্চারণ মেনে শহরটির সরকারি নাম হয়েছে বেঙ্গালুরু। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশন থেকে চড়ে বসলাম যশোবন্তপুর এক্সপ্রেসে। চারটে রাজ্য পেরিয়ে তবে ট্রেন পৌঁছবে বেঙ্গালুরু। আমার ভারী আনন্দ। অনেকক্ষণ ট্রেনে থাকা, ট্রেনেই খাওয়া, ট্রেনেই ঘুম। আগে থেকেই ভেবে রেখেছি যে জানলা অন্য কাউকে ছাড়া যাবে না, স্টেশন দেখতে দেখতে যেতে হবে তো! লক্ষ রাখতে হবে ওই বড় বড় হলুদ রঙের বোর্ডগুলোর দিকে, যেখানে তিনটে ভাষায় লেখা থাকে স্টেশনের নাম — কত নতুন নতুন স্টেশনের নাম জানতে পারব। ট্রেন চলা শুরু করার পর বেশ অনেকক্ষণ অবধি দেখলাম হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় স্টেশনের নাম পড়তে পারছি। তার পর এক সময় বাংলার জায়গা নিল এক নতুন হরফ। সব স্টেশনেই তো আর ট্রেন থামছে না, হুশ হুশ করে ছুটে পার হয়ে যাচ্ছে। ভুবনেশ্বরে যখন ট্রেন দাঁড়াল, বুঝলাম এখন আমরা পাশের রাজ্য ওড়িশায়। ভাল করে দেখলাম, সেই রাজ্যের ভাষা ওড়িয়া হরফের টান। আবার এক সময় ওড়িশা পার হয়ে ট্রেন ঢুকল অন্ধ্রপ্রদেশ। আন্দাজ করলাম, বিজয়ওয়াড়া স্টেশনের নাম লেখা যে হরফে, তা নিশ্চয়ই তেলুগু। কর্নাটকে

ঢুকতেই সেই হরফ বদলে হল কন্নড়। দূরপাল্লার ট্রেনে চড়ার মজাই আলাদা, কেমন চার রকম ভাষা আর তার কিছু কিছু হরফ চেনা হয়ে গেল!

আমাদের দেশ বিরাট বড়। তার নানা জায়গা নানা রকম। কোথাও বা পাহাড়, কোথাও জঙ্গল, কোথাও সমুদ্র বা নদী, কোথাও গিজগিজে ভিড়ের শহর, কোথাও বা মাইলের পর মাইল চাষের জমি, গাছগাছালি ঘেরা গ্রাম। কোথাও ভীষণ শীত, কোথাও বা দারুণ গরম, আবার কোথাও নাকি অবিরাম বৃষ্টি। শুধু কি তাই, এই নানা জায়গার মানুষের কত রকম আলাদা আলাদা ভাষা, ধর্ম, পোশাক-আশাক, বিভিন্ন রকম খাবারদাবার! এই নানা রকম সব মিলেমিশে আমরা থাকি একটা দেশে। এত বিচিত্র আর এত বড় দেশের শাসনের জন্য তো একটা জুতসই ব্যবস্থা চাই! তাই দেশের মাথায় থাকেন প্রধানমন্ত্রী, আর তাঁর মন্ত্রী-সান্ত্রী নিয়ে একটা কেন্দ্র। আর বড় দেশটার আছে অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগ, সব এক একটা রাজ্য। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যকে আলাদা করার ব্যবস্থা থাকে, শাসন করার কাজ ভাগাভাগির জন্য। প্রতিটি রাজ্য শাসন করার দায়িত্বে থাকেন একজন মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর সহযোগীরা। তাঁদের বুঝে নিতে হয় এই অবধি আমার শাসনের এলাকা, তার পরের জায়গাটার দায়িত্ব পাশের রাজ্যের। এই যেমন আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, তেমনই আমাদের পশ্চিম দিকেই ঝাড়খণ্ড, দক্ষিণে ওড়িশা, উত্তর-পূর্বে একটু কোণাকুণি গেলেই অসম। সব জায়গায় কি আর আমরা

যেতে পারি! কিন্তু মানচিত্র দেখে দেখে বেশ চিনে নিই, ভারতের কোথায় কোন কোন রাজ্য। আবার সময় সুযোগ হলে যেতেও পারি কখনও, ট্রেনে বাসে বা প্লেনে চেপে, কোনও ভিন রাজ্যে। সেখানে গিয়ে শুনি অন্য ভাষায় চলছে কথাবার্তা, রাস্তাঘাটে দোকান-বাজারে সেই ভাষায় লেখা শব্দ, খাবারদাবারও অন্য রকম।

শাসনের সুবিধের জন্য তৈরি করা হয়েছে রাজ্যের সীমানা, তা কি আর মাটিতে একই ভাবে খাটে? সীমানা পার হয়ে অন্য রাজ্যে পৌঁছলেই যে ম্যাজিকের মতো সব অন্য রকম হয়ে যায়, তা তো আর নয়! ট্রেনে করে ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুলিয়া এলেই দেখতে পাব, সেখানে স্টেশনের নামে বাংলা হরফ। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে এই অঞ্চলের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে দেখা যায় পুরুলিয়া আর ঝাড়খণ্ডের ভাষা অনেকটাই এক রকম! দুই রাজ্যেই অনেক মানুষ সাঁওতালী ভাষায় কথা বলেন। ইংরেজদের শাসনকালে এই অঞ্চলটা এক সময় সাঁওতাল পরগনা নামের একটা বড় ডিভিশনের মধ্যে ছিল। পরে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়। পুরুলিয়া চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। যাঁরা পুরুলিয়ায় বাংলা বলেন, তাঁদের বাংলা কিন্তু কলকাতার মতো নয়, আর এক রকম টানের বাংলা। রাজ্য এক হলেও, পুরুলিয়া থেকে কলকাতা যে অনেক দূর। অথচ একেবারে পাশেই যে থাকেন ঝাড়খণ্ডের প্রতিবেশীরা, যদিও তাঁরা এখন ভিন রাজ্যের মানুষ। মানুষের প্রতিদিনের জীবনের কথা বলা, মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া,

গানবাজনা তো আর অমন সীমানার কড়াকড়ি দিয়ে আলাদা করা যায় না! প্রতিবেশীর সঙ্গেই তো এ সবের লেনদেন। তাই পাশাপাশি, কাছাকাছি থাকা মানুষের ভাষায় মিল পাওয়া যায়।

সীমানা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। পাশাপাশি থাকা একই ভাষায় কথা বলা মানুষেরা অনেক সময় দুটো আলাদা দেশেও ভাগ হয়ে যেতে পারেন। এই যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একেবারে গায়েই বাংলাদেশ, সেখানেও কিন্তু সকলের ভাষা বাংলা— হয়তো সে বাংলা কথার টান খানিকটা অন্য রকম, কিছু শব্দ আলাদা। ১৯৪৭-এ যখন দেশ ভাগ হল, তখন বাংলা প্রদেশের মধ্যে দিয়ে টানা হল সীমানা। এই সীমানার ভিত্তি ছিল ধর্ম। তাই তো এই অঞ্চলের একই ভাষার মানুষেরা ভাগ হয়ে গেলেন দুটো আলাদা দেশে, কারণ তাঁদের ধর্ম আলাদা। এখনও তাঁরা একই ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু মেলামেশা আর আগের মতো সহজ নয়। ভাবতে কেমন অবাক লাগে, এক দিকে নানা ভাষার বিরাট দেশ ভারতের এক কোণে একটা বাংলা ভাষার রাজ্য, যা এখন পশ্চিমবঙ্গ, আর তার পাশেই একটা গোটা দেশ, যার ভাষা বাংলা। কিন্তু যতই কাছে হোক বাংলাদেশ, বিদেশ তো বটে!

ধর্ম বা ভাষাকে কি ইচ্ছেমতো কাজে লাগিয়ে সীমানা টানা যায়? আর কেনই বা টানা হয় এমন সীমানা? আসলে হঠাৎ করে এক দিন তো আর এমন হয় না। দেশের বা রাজ্যের সীমানাই হোক, বা এক সঙ্গে থাকা মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া বা তৈরি করা নানা সীমানা—

সবের পিছনেই থাকে লম্বা ইতিহাস। কখনও এরকম সীমানা রাষ্ট্র উপর থেকে চাপিয়ে দেয়, মানুষ তার প্রতিবাদ করে। কখনও আবার মানুষ নিজেই দাবি করে সীমানা। নানা ঘটনার ভিড়ের মধ্যে তৈরি হয় এক একটা সময়, যখন ভাষার নামে মানুষে মানুষে সীমানা তৈরি হয়। ইতিহাসের ঝাঁপি থেকে এমন কিছু সময়কে বেছে নিয়ে ব্যাপারটা আর একটু ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

চট্টগ্রাম
ওড়িশা
অসম
সিলেট
বাংলা
বানান
বাংলা
অভিধান
বাংলা
ব্যকরণ
বাংলা
ভাষা

২। ভাষার ছোট-বড়

আমাদের পরিচয়ের অনেকগুলো দিক আছে – ভাষা, ধর্ম, জাত-পাত, কোথায় থাকি সেই জায়গা। ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে কোনও কোনও সময়ে একটা পরিচয় অন্যগুলোকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে। কখনও সেই পরিচয় ঘিরে মানুষ একজোট হয়, কখনও আবার তাই নিয়েই বেঁধে যায় ঝগড়াঝাঁটি। যেমন আমরা জানি যে, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে, মানুষে মানুষে ধর্মের তফাত বড় হল। হিন্দু, মুসলমান এই পরিচয়গুলো তখন আর কেবল পরিচয় থাকল না, শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। শুরু হল দাঙ্গা, হানাহানি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই কিন্তু ভাষার পরিচয় বড় হয়ে উঠল। তখন দেশের বেশ কিছু জায়গায় মানুষ দাবি করতে শুরু করলেন যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য তৈরি করা হোক। অর্থাৎ যেখানে যে ভাষার মানুষ বেশি, তাঁদের নিয়ে সেই ভাষার আলাদা রাজ্য হোক। কিন্তু দেশভাগের আগে অবধি ব্রিটিশ রাজত্বে কিন্তু এমন ভাবে রাজ্য ভাগ করা হয়নি। সেই সময়ের কথা একটু বলে নিই।

ব্রিটিশ আমলে শাসনের সুবিধার জন্য অনেকগুলো প্রদেশ আর জেলায় ভাগ করা ছিল ভারত উপনিবেশ। প্রদেশ কীভাবে ভাগ করা হবে, কোন জেলা কোন প্রদেশে থাকবে, এগুলো ব্রিটিশ সরকার নিজেদের দরকার মতো অনেকবার বদল করেছিলেন। তাঁরা হিসেব করতেন একটা প্রদেশ কত বড় হলে সেখানকার জমিদারদের থেকে সহজে রাজস্ব আদায় করা যাবে,

বা কোন জেলা কোন প্রদেশে থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য করে লাভ করতে বেশি সুবিধে হবে। এইসব হিসেব কষে তাঁরা প্রদেশ, জেলার সীমানা একভাবে টানতেন। তারপর যেমন যেমন বদলাত তাঁদের সেই হিসেব, তেমন ভাবে বদল হত সীমানা। এক ভাষার মানুষের জন্য এক রাজ্য, এরকম কোনও নীতি ছিল না ব্রিটিশ শাসকদের।

সব প্রদেশেই থাকতেন অনেক ভাষার মানুষ। কিন্তু ক্ষমতার ভাগাভাগি তো আর একেবারে সমান সমান ছিল না – বড় প্রদেশগুলোতে কোনও এক ভাষার মানুষের জোর খাটত বেশি, অন্যদের একটু কম। তাই একসঙ্গে মিলেমিশে এক প্রদেশে থাকলেও বড়-ছোট, শক্তিশালী-কমজোরি, এরকম তফাৎ ছিল নানা ভাষার মানুষের মধ্যে। যেমন ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে, সেই ১৭৬৫ সাল থেকে, বাংলা, বিহার, ওড়িশা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিরাট বড় বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। পরে ১৮২৬ সালে যখন অসম জয় করল ইংরেজ শক্তি, তাকেও ঢুকিয়ে নিল এই প্রদেশেই। ভেবে দেখো, কত ভাষার মানুষই না ছিলেন এই একটা প্রদেশে। বাঙালি বাদেও ওড়িয়া, অসমীয়ার মতো আরও অনেক ভাষার বহু মানুষ ছিলেন এখানে। তাছাড়া বাংলা ভাষাই কি আর একরকম? তারও তো ছিল কত রকমফের। তাই তো ভাষার লড়াইয়ের ইতিহাস পড়তে গেলে দুই দিকই ভালো করে বুঝতে হয়। একদিকে নানা ভাষার মধ্যে লড়াই – কোন ভাষা একটু বেশি জায়গা করে নিল, কোন ভাষা রইল পিছিয়ে। অন্যদিকে একটা ভাষার মধ্যের লড়াই। মানে যদি বলি বাংলা ভাষা বাকিদের পিছনে ফেলে

এগিয়ে গেল, তাহলেও তো বুঝতে হবে সেই বাংলা কোন জায়গার বাংলা, কার বাংলা। শান্তিপুরের বাঙালি বলতেন এক রকম বাংলা, চট্টগ্রামের বাংলার সঙ্গে তার তফাৎ অনেক। সিলেটের বাংলার এক টান, কলকাতার একেবারে আর এক রকম।

শুরু থেকেই দেখা গেল বাংলা প্রদেশে কলকাতা আর তার আশেপাশের বাঙালিরা অন্য জায়গার বাঙালিদের চেয়ে, আর অন্য ভাষার মানুষের চেয়ে, ক্ষমতায় এগিয়ে গেলেন। আসলে বাংলা প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতা শহর। সেখানে গোড়া থেকেই ইংরেজদের শাসন ছিল খুব পাকাপোক্ত। দুর্গ, কল-কারখানা, কোর্ট-কাছারি তৈরি হয়েছিল কলকাতা আর তার আশেপাশের অঞ্চলে। প্রথমদিকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাপাখানাও তৈরি হয়েছিল এখানেই। এই অঞ্চলের বাঙালিরা ইংরেজি শিখে দারুণ পটু হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজ সরকারের আপিস-কাছারিতে কেরানির কাজে। তাই কলকাতার বাঙালি বাংলা প্রদেশের নানা রকম চাকরি-বাকরিতে সুযোগ সুবিধে পেলেন বাকিদের আগে। ফলে অন্য অঞ্চলের বাঙালিদের, এবং অন্য ভাষার মানুষদের পিছনে ফেলে ক্ষমতায় এগিয়ে রইলেন তাঁরা।

কেবল চাকরিতে বা উপার্জনে কলকাতার বাঙালিরা এগিয়ে থাকলেন, তাই নয়। উনিশ শতক জুড়ে কলকাতা হয়ে উঠল বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতির কেন্দ্র। ইংরেজরা তো এ দেশে এসেছিলেন ব্যবসা করতে, আর রাজত্ব করতে। অন্য দিকে একই সময়ে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচার করতে পশ্চিম থেকে এসেছিলেন অনেক সাহেব-মেম, যাঁদের মিশনারি বলা হত। তাঁরা এক

একটা জায়গায় গিয়ে সেখানকার মানুষের কথা বলার ভাষায় নিজেদের ধর্মের কথা ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। তাঁরা ভেবেছিলেন নিজেদের ভাষায় শুনলে বেশি সংখ্যক মানুষ বুঝতে পারবেন তাঁদের কথা, হয়তো রাজি হবেন খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিতে, সফল হবে মিশনারিদের দূর দেশে আসা। তাই অনেক অঞ্চলেই মিশনারিদের তাগিদে প্রথম ছাপাখানা খোলা হয়েছিল যেখানে স্থানীয় ভাষার ব্যাকরণ বই ছাপা হত, বাইবেলও ছাপা হত। ১৮০০ সালে কলকাতার খানিক দূরেই শ্রীরামপুরে মিশনারিরা ছাপাখানা খুলেছিলেন। সেখানে বাংলা ভাষায় ছাপা শুরু হল অনেক বই। কলকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালিরাও ছাপাখানার প্রযুক্তি শিখে বাংলা ভাষায় ছাপানো শুরু করলেন কত বই। বানান, ব্যাকরণের নিয়মে বেঁধে বাংলা ভাষাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলতে চাইলেন তাঁরা। বাংলায় লেখা, বাংলায় ছাপা আর বাংলা বই কেনাবেচার বাজার— এই সবটাই তখন তাঁদের হাতে। এত ভাষার প্রদেশে অসমীয়া, ওড়িয়ার চেয়ে বাংলা ভাষার ক্ষমতা হল বেশি। তা বলে সব জায়গার, সব জেলার বাংলাই কি আর একইভাবে ক্ষমতা পেল? তা নয় কিন্তু। কেবল কলকাতা আর তার চারপাশের শিক্ষিত, শহুরে বাঙালিদের হাত ধরে যে বাংলার চর্চা শুরু হয়েছিল, সেটাই আস্তে আস্তে সবচেয়ে উঁচুদরের বাংলা বলে কদর পেয়েছিল। স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় এই বাংলা স্বীকৃতি পেল, সাহিত্যচর্চায়ও এই বাংলার রমরমা হল। পুরুলিয়ার, বাঁকুড়ার যে বাংলা, অথবা নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, সিলেটের যে বাংলা, তারা ফিকে হয়ে পড়ল কলকাতার বাংলার তেজের কাছে।

একরকম বাংলা ক্ষমতায় বড় হল যেই, বাকিরা কেমন খাটো হয়ে গেল তার কাছে। কলকাতার বাঙালিদেরও ভারী দেমাগ হল। ছাপাখানা, বইয়ের বেচা-কেনার বাজার, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা ইউনিভার্সিটি সবই তো কলকাতাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল। বাংলা প্রদেশের দূরের সব জেলা থেকে অনেকে পড়াশোনা করতে আসতেন কলকাতায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিন চন্দ্র পাল সিলেট জেলা থেকে পড়তে এসেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলকাতা আসার পর প্রথমদিকে কিন্তু ভারী বিপাকে পড়েন তিনি। কলকাতায় সবাই কেমন ধোপদুরস্ত শহুরে বাংলা বলে, আর তিনি কথা বলেন সিলেটি টানের বাংলায়। তেমনই চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর-খুলনা থেকে আসা ছাত্ররাও কেউই তো কলকাতার টানে বাংলা বলতেন না। এদিকে কলকাতার ছাত্ররা খুব ঠাট্টা তামাশা করতেন অন্যদের মুখের বাংলা নিয়ে। বিপিন পাল তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, দূর দূর থেকে আসা ছাত্ররা কলকাতায় পৌঁছেই প্রাণপণে চেষ্টা করতেন সেখানকার বাংলা রপ্ত করতে, নাহলে কেমন করে মেলামেশা করবেন শহুরে বন্ধুদের সঙ্গে! তাই তো বলছিলাম, একটা ভাষার মধ্যেও থাকে নানা লড়াইয়ের ইতিহাস। যাঁদের ভাষা স্বীকৃতি পায় না তাঁরা পিছিয়ে পড়ে নানাভাবে। আর পিছনে পড়ে থাকতে আর কেই বা চায়!

ভাষা অনুযায়ী রাজ্য ভাগ ব্রিটিশদের সময়ে হয়নি ঠিকই, কিন্তু অনেক ভাষার মধ্যে কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে, কার শক্তি আর ক্ষমতা বেশি, কার কম—এই লড়াইয়ের সব আয়োজন ব্রিটিশদের রাজত্বের গোড়া থেকেই নানা ভাবে তৈরি হয়েছিল। তাঁর উপর আবার জুড়েছিল সংখ্যার হিসেব।

এত বড় ভারত উপনিবেশের এত রকম মানুষকে শাসন করার জন্য তাঁদের সম্পর্কে সব কিছু জানা দরকার— এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ শাসকরা। তাই রাজত্বের কোন অঞ্চলে কত জন মানুষ থাকেন, তাঁরা কী খান, কী পরেন, কোন দেবতার পুজো করেন, কোন ভাষায় কথা বলেন, এই সব খুঁটিনাটির খোঁজখবর নিয়ে তা থেকে মোটা মোটা রিপোর্ট আর লম্বা লম্বা তালিকা তৈরি করতেন সরকার। এমন তালিকাকে তাঁরা বলতেন সেনসাস। ব্রিটিশ ভারতে এরকম জনগণনা বা সেনসাস তৈরির কাজ শুরু হয় ১৮৭২ সালে, আর প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। সেনসাস দেখলেই তাতে খুঁজে পাওয়া যেত একটা প্রদেশে কোন ভাষার মানুষ সংখ্যায় বেশি, আর কোন ভাষা সংখ্যায় কম। পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যেত, কোন ভাষার মানুষের কী ধর্ম। যেমন ধরা যাক, বাংলা প্রদেশের জন্য যে তালিকা, সেখানে লেখা থাকত কত জন বাংলায় কথা বলেন, কত জন অন্যান্য ভাষায়। আবার, যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের মধ্যে কত জন হিন্দু, কত জন মুসলমান, তাও হিসেব করা যেত তালিকা থেকে। এতকাল একসঙ্গে পাশাপাশি থাকা মানুষেরাও নিজেদের সংখ্যার বিচারে দেখা শুরু করেছিলেন। ধর্মের পরিচয়, ভাষার পরিচয় ঘিরে যখনই লড়াই বেঁধেছে, কে সংখ্যায় বেশি আর কে কম, সেই প্রশ্ন আস্তে আস্তে খুব জরুরি হয়ে উঠছিল।

একটু আগেই বলছিলাম, নানা লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে ব্রিটিশরা প্রদেশ ভাগ করতেন, অথবা জোড়া লাগাতেন। এমন ভাঙ্গা-জোড়া, নতুন সীমানা টানার খেলায় অনেকসময় এক ভাষার

মানুষ দুই প্রদেশে ভাগ হয়ে যেতেন। আবার অনেকসময় এক ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া হত অন্য ভাষা। এসব কিন্তু সাধারণ মানুষ মোটেই চুপচাপ মেনে নেননি। নানা সময়ে নানা প্রদেশে নিজেদের ভাষার জন্য লড়াই করেছেন বহু মানুষ। স্বাধীনতার পরেও এদেশে নানা রাজ্যে চলেছে ভাষার লড়াই। তেমন সবকটা লড়াইয়ের কথা তো আর এখানে বলতে পারব না, এই বইয়ে তত জায়গাই নেই। তাই পূর্ব ভারতের দুটো ভাষা— বাংলা আর অসমীয়া— এদের ইতিহাস একটু ফিরে দেখি আমরা। এখনকার বাংলা ভাষার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আর তার প্রতিবেশী বাংলাদেশের ভাষার লড়াইয়ের গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। আর বাংলার গায়েই তো অসম, দুই জায়গার ইতিহাসকে আলাদা করাই মুশকিল। তাই অসমের ভাষার লড়াইয়ের কথাও বলব নাহয়।

৩। বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ

(ক) বঙ্গভঙ্গ আর তার বিরুদ্ধে একজোট হওয়া

১৯০৫ সাল। ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশদের রাজত্ব। বলছিলাম না, শুরু থেকেই বিহার, ওড়িশা, অসম এই সমস্ত অঞ্চল বিরাট বড় বাংলা প্রদেশের মধ্যেই ছিল। কিন্তু অসম পেরিয়ে উত্তর-পূর্বের পাহাড়গুলোতে রাজত্ব বিস্তারে কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না ব্রিটিশ শাসকরা। তাই শেষ পর্যন্ত ১৮৭৪-এ তৈরি হল আলাদা অসম প্রদেশ। ঠিক হল, বাংলার সমতলের অঞ্চলকে আগের মতোই শাসন করা হবে, কিন্তু অসম আর তার আশেপাশের পাহাড়কে আনা হবে আর একটু কড়া শাসনে। এরকম আরও অনেক প্রদেশ নিয়ে ভাঙ্গা-জোড়ার পরীক্ষানিরীক্ষা চলত সেই আমলে, লাভ-ক্ষতির অঙ্ক মেনে। ১৮৭৪-এ অসম আলাদা প্রদেশ হল ঠিকই, কিন্তু তাও চেহারায় বাংলা প্রদেশ বেশ বড়ই রইল— আজকের প্রায় পুরো পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার আর বাংলাদেশের বেশিটাই তখনও বাংলা প্রদেশ। ১৯০৫-এ বাংলা প্রদেশে একটা বড় রকম বদল আনল ইংরেজ সরকার। শাসকরা বললেন, এত বড় প্রদেশ সামলাতে তাঁরা হিমশিম খাচ্ছেন —তাই বাংলাকে দুটো ভাগে ভাগ করে শাসনের কাজ একটু সহজ করা দরকার। সেই মতো বাংলার পূর্ব দিককে আলাদা করে অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তৈরি হল 'পূর্ববাংলা ও অসম' প্রদেশ। পশ্চিম দিকের অংশটা রইল বিহার, ওড়িশার সঙ্গে জুড়ে, কলকাতা থাকল এই পশ্চিমের অংশে।

আগেই বলেছি, কলকাতার শিক্ষিত, ইংরেজি জানা, শহুরে বাঙালির হাত ধরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার খুব জাঁকজমক হয়েছিল। এঁরা বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু বাঙালি। শুধু কলকাতা নয়, বাংলা প্রদেশের পশ্চিম দিকটায় চিরকালই হিন্দু বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি। আর মুসলমান বাঙালি বেশি পূর্ব দিকে। যখন ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে দু'ভাগ করার কথা ঠিক করল, তখন ঢাকাকে পূর্ব বাংলা ও অসম প্রদেশের রাজধানী করার কথাও ভাবল তারা। কলকাতার মতোই জমকালো শহর হয়ে উঠবে ঢাকা, এমন কথাও বলল সরকার। কিন্তু এই ভাগের ফলে যা দাঁড়াল, তাতে ঠিক যেন মনে হল যে ইংরেজ শাসকরা পূর্ব বাংলার মুসলমান বাঙালি আর পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালিদের আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আচমকা তাঁদের প্রদেশকে ভাগ করে দেওয়ায় বাংলার অনেক মানুষ খুব চটে গেলেন। তাঁরা বললেন, আসলে তো দুই বাংলায় সবাই একই ভাষার মানুষ। তাঁরা সবাই একটাই প্রদেশে থাকবেন, কিছুতেই তাঁদের আলাদা করা চলবে না।

ইতিমধ্যে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে এক রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশদের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করা শুরু করেছিল উনিশ শতকের শেষ থেকেই। কংগ্রেসি নেতাদের হাত ধরে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন বাংলায় বেশ জোরদার হচ্ছিল আস্তে আস্তে। বাংলা ভাগের কথা যেই উঠল, কলকাতার কংগ্রেসের নেতারা আর শিক্ষা-সাহিত্য জগতের তাবড় সব মানুষেরা এক জায়গায় এলেন। ভাষার পরিচয়কে বড় করে তাঁরা

সারা বাংলার মানুষকে একজোট করার চেষ্টা করলেন। প্রথম দিকে সই করে, পিটিশন জানিয়ে প্রতিবাদ শুরু হল। তারপর ব্রিটিশ জিনিসপত্র বয়কট করা শুরু হল। নিজেরা স্বদেশি জিনিস বানিয়ে ব্রিটিশদের কাবু করা হবে, এমনটাই ঠিক হল। ব্রিটিশদের মস্ত জোরের জায়গা ছিল ব্যবসা। দেশের মানুষ ইংল্যান্ডে তৈরি বিদেশি জিনিসের বদলে স্বদেশি জিনিস কিনতে আরম্ভ করলে ব্রিটিশদের সেই ব্যবসা মার খাবে, আর তারা মুশকিলে পড়বে, এই ছিল ভাবনা। ১৯০৫-এর জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করল সরকার। ঠিক হল ১৬ই অক্টোবর ভাগ হবে বাংলা প্রদেশ। সেই দিন ছিল রাখি উৎসব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডাক দিলেন সকলকে—বললেন, হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে রাখি পরিয়ে পালন করুক দিনটা। বাংলার দিকে দিকে রাখিবন্ধন পালন করলেন দুই ধর্মের কিন্তু একই ভাষার মানুষ। ভাষা যেন রাখির সুতোর মতো, বেঁধে রাখতে পারে বাংলার সব মানুষকে। বাংলার মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

কিন্তু সত্যিই কি গোটা প্রদেশের সব বাঙালি মিলেমিশে একসঙ্গে এই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সমান ভাবে সামিল হয়েছিলেন? না, তেমনটা হয়নি। ওই যে বললাম, কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি বেড়ে উঠেছিল, তার সামনের সারিতে ছিলেন হিন্দু, শিক্ষিত বাঙালি। বাংলার মানুষকে এক করে বাংলা ভাগ আটকাতে তাঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ভাষার পরিচয় এক হলেও সব বাংলাভাষী মানুষ তো আর সমান ছিলেন না। গরিব বাঙালি-

বড়লোক বাঙালির মধ্যে তো তফাৎ ছিল বটেই। দেখা গেল যে, হিন্দু বাঙালি আর মুসলমান বাঙালিরাও ক্ষমতার দিক থেকে সমাজে একই জায়গায় নেই। কেন, খুলে বলি।

সহজ ভাবে ভাবলে আমাদের কী মনে হয়? অত্যাচারী রাজা, আর তার বিরুদ্ধে দল বেঁধেছেন প্রজারা। শক্ত হয়ে দল বেঁধে লড়াই করতে পারলেই তাঁরা হারাতে পারবেন রাজাকে। কিন্তু প্রজারা তো আর সবাই সমান নন, তাঁদের নিজেদের মধ্যেও যে নানা খটাখটি। বড়লোক জমিদার, আর তাঁর জমিতে ফসল ফলান যে গরিব চাষি, দু'জনেই ব্রিটিশদের প্রজা, আর তাঁরা একই ভাষায় কথাও বলেন। কিন্তু তাঁরা কি আর সমান? সমাজে তাঁদের ক্ষমতার ফারাক বিস্তর। তাই একটা পরিচয়ের জোরে যখন দল তৈরি করা হয়, জোট বাঁধা হয়, তাতে অনেকসময় একরকম মানুষ বেশি করে সামিল হন, বাকিরা বাদ পড়েন। বাংলা ভাগের প্রতিবাদে স্বদেশি আন্দোলন দানা বাঁধল। আন্দোলনের নেতারা ছিলেন কলকাতার সেই সব বাঙালি, যাঁদের শিক্ষার জোর আর টাকা-পয়সার জোর—দুইই বেশি। তাঁরা বললেন যে, বিলিতি জিনিস বয়কট করা হোক। এদিকে গরিব চাষিরা, ছোট ব্যবসায়ীরা পড়লেন ভারি অসুবিধায়। অনেক বিলিতি জিনিস ছিল সস্তা। তার বদলে বেশি দামে স্বদেশি জিনিস কেনা-বেচা করতে বাধ্য হলেন তাঁরা। কেমন করে বাংলার গরিব মানুষ নামবেন এমন লড়াইয়ে, যেখানে তাঁদের ক্ষতিই বেশি? তাই তাঁরা এমন অসম জোটে সামিল হতে পারলেন না।

বাংলা ভাগ হওয়ায় কলকাতা আর বাংলার একমাত্র রাজধানী থাকল না। ঢাকায় তৈরি হল

নতুন বাড়ি-ঘর, ইংরেজদের আনাগোনা বাড়ল সেই শহরে। মুঘল আমলে এক সময়ে ঢাকার খুব জৌলুস ছিল, কিন্তু তারপর নানা কারণে তা ফিকে হয়ে আসে। বাংলা ভাগের পর আবার মনে হল ঢাকার ভাগ্য ফিরবে। তখন পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা অনেকেই ভাবলেন যে পূর্ব দিকটা আলাদা হয়ে ঢাকা যদি বাংলার আর একটা রাজধানী হয়, তাহলে মন্দ কি? আগেই বলেছি, পূর্ব বাংলায় মুসলমান বাঙালি ছিলেন বেশি। তাঁদের অনেকেই ঢাকায় নতুন রাজধানী হওয়ায় খানিক খুশিই হলেন। তাঁদের মনে হল যে এত দিন অনেক সুযোগ-সুবিধেই তো কলকাতার আশপাশের হিন্দু বাঙালিরা বেশি পেয়েছেন, এবার নাহয় আমরা সেগুলো পেলাম। তাঁরাও তাই আস্তে আস্তে সরে এলেন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন থেকে। ভাষার পরিচয় নিয়ে শুরু হয়েছিল লড়াই। কিন্তু গরিব-বড়লোকের তফাৎ, আর ধর্মের তফাৎ, দুই-ই এসে ঢুকেছিল সেই লড়াইয়ে।

বাংলা ভাগের পক্ষে-বিপক্ষে নানা স্বর থাকলেও, প্রতিবাদের জোরটাই কিন্তু ছিল বেশি। পিছু হঠল ব্রিটিশ সরকার। ১৯১১ সালে বাংলাকে আবার এক করা হল। বলছিলাম না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন পরিচয় কখন বড় হবে, সেই হিসেব বদলায়। আরও চার দশকের মধ্যেই দেখা গেল যে ভাষা নয়, বরং ধর্মের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে খুব বড় আকারে। ১৯৪৭-এ তা ডেকে আনল ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ। তৈরি হল দুটো দেশ— ভারত আর পাকিস্তান। তাল মিলিয়ে ভাগ হল বাংলাও। পূর্ব দিকটা হল পাকিস্তানের অংশ, নাম হল পূর্ব পাকিস্তান। আর

পশ্চিমবঙ্গ রইল ভারতে। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যায় মুসলমান বেশি আর পশ্চিমবঙ্গে বেশি হিন্দু—দু'তরফেই ভাষা কিন্তু বাংলা। ১৯০৫-কে বলা যায় প্রথম বঙ্গভঙ্গ, আর ১৯৪৭-এ হল দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ। তবে ১৯০৫-এর সঙ্গে খুব বড় তফাৎ হল একটা। প্রথমবার ব্রিটিশরা বাংলা ভেঙ্গে দুটো আলাদা প্রদেশ করেছিল। ১৯৪৭-এ কিন্তু দুই বাংলা গিয়ে পড়ল দুটো আলাদা দেশে।

(খ) বাংলার জন্য আলাদা দেশ

ধর্মের নামে দেশ তো ভাগ হল। কিন্তু তার পরেই আবার শুরু হল ভাষার পরিচয় নিয়ে লড়াই। এই বার লড়াইয়ের কেন্দ্রে ঢাকা— পূর্ববঙ্গের রাজধানী। পাকিস্তানের নতুন সরকারের ঘাঁটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, যা ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভাগ হয়ে তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানের মাথায় যাঁরা সরকার চালানোর দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাংলাভাষী ছিলেন কম। সেই দেশের ভাষা নিয়ে নিয়মনীতি তৈরির সময় বাংলার কথা ভাবা হল না। দেশভাগের আগে থেকেই ভারতের উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমের মানুষের মধ্যে উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ঠিক করল যে নতুন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে উর্দু। এ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষা যে বাংলা। তাঁরাও তো এই দেশেরই মানুষ। কোনও দিন তাঁরা উর্দু পড়েননি, বা সে ভাষায় কথা বলেননি। তাই তাঁরা মেনে নিতে চাইলেন না এমন নির্দেশ। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁদের নাড়ির টান। তাছাড়া রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে সরকারি কাজ হবে সে ভাষায়। বাঙালিদের আশঙ্কা হল, সরকারি চাকরিতে তাঁরাই সুযোগ পাবেন যাঁদের উর্দু জানা থাকবে।

পূর্ব পাকিস্তানে দাবি উঠল উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাও চালু রাখা হোক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাঁরা সরকার চালাচ্ছিলেন, তাঁরা অনড়। তাঁরা দেশের টাকাপয়সা আর স্ট্যাম্প থেকে সরিয়ে ফেলতে লাগলেন বাংলা অক্ষর। স্কুল, কলেজের লেখাপড়াও যাতে উর্দুতেই হয়, এমন ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী

নাজিমুদ্দিন রাজধানী করাচি থেকে এলেন ঢাকায়। সেখানে পল্টন ময়দানের বিরাট জনসভায় তিনি জোর গলায় সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে উর্দুই থাকবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা, আর কোনও নড়চড় হবে না এই সিদ্ধান্তে। প্রতিবাদের ঝড় উঠল চারিদিকে। ছাত্র, শিক্ষক, আর সমাজের সব স্তরের মানুষ ঢাকার রাস্তায় নামলেন প্রতিবাদে। সরকার কড়া হাতে বেআইনি ঘোষণা করল মিটিং, মিছিল, জমায়েত।

২১শে ফেব্রুয়ারির সকাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিরাট মিছিলের আয়োজন করছেন। এদিকে সরকার সারা শহরে সেপাই মোতায়েন করেছে, নজর রাখছে চারিদিকে। প্রতিবাদ করতে কেউ রাস্তায় নামলেই হবে শাস্তি। এসব অগ্রাহ্য করে বহু ছাত্র প্রথমে জড়ো হলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে মিছিল করে তাঁরা যাওয়া শুরু করলেন ঢাকার বিধানসভার দিকে। রাস্তায় পুলিশ লাঠি দিয়ে মারধর করে আটকানোর চেষ্টা করল মিছিল। বহু ছাত্র আহত হলেন। বাকিরা এগিয়ে চললেন। বিধানসভা পৌঁছে চারিদিক ঘিরে ফেললেন তাঁরা। পুলিশ তখন আক্রমণ করল বন্দুক হাতে। গুলি চলল মিছিলের উপরে। প্রাণ হারালেন বেশ কয়েকজন ছাত্র, জখম হলেন আরও অনেকে। লেখক, সাংবাদিক আব্দুল গাফফর চৌধুরী তখন ঢাকায় পড়াশোনা করেন। গুলি চলার খবর পেয়ে ছুটে গেলেন মিছিলের ছাত্রদের খোঁজ নিতে। সালাম, রফিক, সফিউর, জব্বার, বরকতের মৃত, রক্তাত দেহ নাড়িয়ে দিল তাঁকে। পরদিন খবরের কাগজের শেষ পাতায় 'একুশের গান' নামে ছাপা হল তাঁর লেখা কবিতা, যদিও লেখকের নাম

ছাপা হয়নি সেদিন। পরে সুর দিয়ে সেই কবিতাই হল ভাষা শহীদদের স্মরণ করার গান। আজও প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি মিছিল করে এই গান গেয়ে সকলে শ্রদ্ধা জানান ভাষার জন্য প্রাণ কবুল করা মানুষদের। খানিকটা এইরকম সেই গান:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া-এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশের ঘটনায় মানুষের রাগ সাংঘাতিক বাড়ল, প্রতিবাদ আরও জোরালো হল, ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব পাকিস্তানের অনেক জেলায়। দু'বছর পর পাকিস্তান সরকার বাধ্য হল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলে মেনে নিতে। সংবিধান শুধরে লেখা হল যে, পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু আর বাংলা। মাতৃভাষার জন্য লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের স্মৃতিতে ঢাকায় তৈরি হল শহিদ মিনার। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটা পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

বাংলা ভাষাকে নতুন দেশে জায়গা করে দেওয়া হল ঠিকই, তবুও বাঙালি-প্রধান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ছিল অনেক অভিযোগ। তাঁরা মনে করতেন প্রথম থেকেই পাকিস্তান সরকার একচোখা ভাবে শাসন চালিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সরকারি কাজে, সেনাবাহিনীতে, এবং আরও নানা ক্ষেত্রে ক্ষমতা পেয়েছে অনেক কম। টাকাপয়সাও সরকার বেশি খরচ করত পশ্চিমে। তাই তাঁরা মেনে নিতে পারেননি পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া শাসন। তার উপর ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার রাগ তো ছিলই। এই সব রাগ, অভিযোগ থেকেই আস্তে আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে নিজেদের একটা আলাদা দেশ হোক এরকম ইচ্ছে তৈরি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন 'বাংলাদেশ'-এর জন্য দাবি জোর পেল। ১৯৭১ সালে অনেক রক্তপাত, অনেক ধ্বংসলীলার পর জন্ম নিল বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার মানুষ নিজেদের এক জাতি ভেবে, একজোট হয়ে তৈরি করলেন নিজেদের আলাদা

দেশ। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিতেও পিছপা হননি ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলের মানুষ। তাই তো এই দিনটা পৃথিবীর সকলের জন্য মাতৃভাষা দিবস। ১৯০৫ সালে ইংরেজরা বাংলা ভাগ করার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা বাংলার মানুষকে এক করে রাখার জন্য গান লিখেছিলেন, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’। সেই গানই ১৯৭১-এ হল নতুন জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

நன்றி
धन्यवाद
Thank You
شکریہ
ধন্যবাদ
ଧନ୍ୟବାଦ

৪। ভাষাই বাঁধে, ভাষাই ভাঙে?

(ক) ভাষার জন্য রাজ্য

ফেরা যাক আমাদের দেশ ভারতের কথায়। এ দেশের মজাটাই হল অনেক রকম ভাষার মানুষ মিলেমিশে এক হয়ে থাকা, সে যেন এক হইহই ব্যাপার। এই যেমন শুরুতেই বলছিলাম, এক এক রাজ্যে এক এক ভাষার মানুষ থাকেন। আবার একটা রাজ্যের মধ্যেও তো থাকেন কত ভাষার মানুষ। আমাদের রাজ্যেও বাংলা বাদে আরও কত ভাষার আনাগোনা। দার্জিলিং বেড়াতে গেলেই আলাপ হয় নেপালি ভাষায় কথা বলা মানুষদের সঙ্গে। অনেকটা সময় সেখানে থাকতে পারলে, একটু একটু শিখেই নেওয়া যায় তাঁদের ভাষা। চাইলেই শোনা যায় তাঁদের ইতিহাস, আদব-কায়দা, রীতিনীতি, দিনযাপনের গল্প। এই সব হরেক রকম গল্প উপভোগ করেই তো আমাদের একটা দেশে থাকা।

কিন্তু ভাষা কি শুধুই বেঁধে রাখে? চারপাশে যে এর উল্টো ছবিও দেখি আমরা। সব রাজ্যেই অনেক ভাষার মানুষ থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে ভাষার মানুষ সংখ্যায় বেশি বা ক্ষমতায় বেশি, তাঁদের ভাষাই হয় সেই রাজ্যের ভাষা। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মানুষ বেশি, তাই তো বেশিরভাগ স্টেশনের নামে বাংলা, স্কুলে বাংলা পড়ি আমরা। কিন্তু আগেই আমরা পড়লাম, সংখ্যায় বড় হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই ক্ষমতায় বড় হয়ে উঠেছিল

কলকাতার বাংলা। এমন ক্ষমতার তফাতের ফলে একই রাজ্যে বড় ভাষা, ছোট ভাষার ভেদাভেদ তৈরি হয়। যে ভাষার মানুষ ক্ষমতায় পিছিয়ে, তাঁদের মনে হয় যে বড় ভাষার খুবই দাপট, আর আমরা একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছি! সব সুযোগ-সুবিধা বড় ভাষার মানুষেরাই পাচ্ছেন! তখন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলা শুরু করেন যে আমরা এই রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে নিজেদের আলাদা রাজ্য চাই। তাঁরা আস্তে আস্তে দলে ভারী হন, জোরালো হয় আলাদা রাজ্যের দাবি। সব রাজ্যেই যে সারাক্ষণ সবাই আলাদা হতে চাইছেন, এমনটা নয় কিন্তু— অনেক রাজ্যেই দিব্যি মিলেমিশে আছে অনেক ভাষা। কিন্তু কোথাও কোথাও এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার জোর লড়াই বাঁধে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে এরকম লড়াই। কখনও কখনও সেই লড়াই পাল্টে দিয়েছে রাজ্যের সীমানা, তৈরি হয়েছে নতুন রাজ্য।

ভারত যখন স্বাধীন হয়, ধর্মের ভিত্তিতে দেশের ভাগও হয়েছিল। ধর্মের পরিচয় তখন অন্য সব পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিল, চারিদিকে ধর্মের নামে হানাহানি, দাঙ্গা। এমন টালমাটাল অবস্থায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীন দেশের সরকার তৈরি করল। এদিকে ধর্মের হানাহানি থামার আগেই ভাষার পরিচয় মাথা চাড়া দিল। দেশের নানা জায়গায় শোনা গেল ভাষার ভিত্তিতে আলাদা রাজ্য তৈরি করার দাবি। ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশে এক সঙ্গে তামিল,

মলয়লম, তেলুগু, কন্নড় আর মারাঠি ভাষার মানুষ থাকতেন। স্বাধীনতার পরপরই তেলুগু ভাষার মানুষেরা মাদ্রাজ থেকে আলাদা হওয়ার দাবি করলেন। তাঁরা অভিযোগ করলেন যে এই রাজ্যে তামিলদের ক্ষমতা অনেক বেশি, অন্য সব ভাষার উপর খবরদারি চলে তাঁদের। এবার আমাদের ভাষার মানুষের জন্য আলাদা রাজ্য হোক। সেখানে আমাদের সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা হবে বেশি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কংগ্রেস মনে করত যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য তৈরি হওয়া উচিৎ। কিন্তু স্বাধীন দেশের সরকারে এসে তারা মত পালটাল। তাদের মনে হল যে এই কঠিন সময়ে এত বড় দেশের এত রকম মানুষকে এককাট্টা করে বেঁধে রাখা এখন সবচেয়ে জরুরি। তবেই তো এই বিরাট দেশের এত মানুষ ভারতকে 'আমার দেশ' বলে ভাবতে শিখবে, তার নিয়মকানুন মানতে শিখবে। একজন মানুষের তো নানা পরিচয়— সে ভারতীয়, হয়তো সে বাঙালি, আর ধর্মের দিক থেকে সে হিন্দু বা মুসলমান। নতুন সরকার বলল, হতেই পারে তুমি কথা বলো বাংলায়, পুজো দাও মন্দিরে বা মসজিদে নমাজ পড়ো, কিন্তু সবার উপরে মনে রেখো যে তুমি ভারতীয়, এটাই তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। দেশভাগের মারপিটে এমনিতেই কে হিন্দু কে মুসলমান এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ভাবল এই অবস্থায় আলাদা আলাদা ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য ভাগ করা শুরু করলে কে বাঙালি আর কে তামিল,

কে মারাঠি আর কে পঞ্জাবি, এই সব প্রশ্ন বড় হয়ে উঠবে, ভারী মুশকিল হবে দেশের মানুষকে এক করে রাখা। ভারতীয় হওয়ার বড় আবেগের চেয়ে নানা ভাষার ছোট ছোট আবেগ মাথাচাড়া দেবে। তাই ভাষার দাবিকে মুলতুবি রাখা হল তখনকার মতো।

এদিকে, সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে ভাষার আবেগ আরও জোরালো হল। তেলুগু ভাষার যে সব মানুষ আলাদা রাজ্য চাইছিলেন, তাঁদের নেতা ছিলেন কংগ্রেস দলেরই পট্টি শ্রীরামুলু। রাজধানী দিল্লিতে বসে বড় নেতা মন্ত্রীরা যাই বলুন না কেন, তিনি মনে করতেন তাঁর ভাষার লোকেদের জন্য আলাদা রাজ্য দরকার। তিনি গান্ধীবাদী মানুষ ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর মতো অনশন করে প্রতিবাদ করায় বিশ্বাস ছিল তাঁর। ইংরেজ শাসকেরা খুব ভয় পেতেন গান্ধীর অনশনকে। তাঁরা জানতেন যে, গান্ধীর শরীর যদি খারাপ হয়, দেশের মানুষ দলবল মিলে রাস্তায় নেমে ভারী আন্দোলন করবে তাঁদের বিরুদ্ধে। স্বাধীন দেশে তো আর অত্যাচারী ব্রিটিশ নয়, এখন নিজেদের সরকার। তাঁরাও দাবিদাওয়া কানে তুলছে না দেখে পট্টি শ্রীরামুলু বেছে নিলেন সেই অনশনের রাস্তা। তবে তাঁর অনশনেও দিল্লির নেতাদের মত পাল্টালো না। ৫৬ দিন অনশন করার পর মারা গেলেন পট্টি শ্রীরামুলু। এরপর ভয়ংকর ক্ষেপে উঠলেন তেলুগু ভাষার মানুষেরা। স্বাধীন দেশের নতুন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হল মাদ্রাজে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন বেগতিকে পড়লেন। পরিস্থিতি শান্ত

করতে আলাদা তেলুগু রাজ্যের দাবি মেনে নিলেন তিনি। তৈরি হল অন্ধ্রপ্রদেশ। এই ঘটনার পরেই নানা জায়গায় ধামাচাপা পড়ে থাকা ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যের দাবি হঠাৎ জোরালো হয়ে উঠল। কন্নড়, তামিল, মারাঠি, পঞ্জাবি, এই সব ভাষার মানুষও চাইলেন যে তাঁদের আলাদা রাজ্য হোক।

কেন্দ্রে সরকার দেখল ভারী বিপদ। দেশে ঐক্য আসবে কী করে, শুধুই যে আলাদা আলাদা ভাষার পরিচয় মাথাচাড়া দিচ্ছে। আবার, সবাইকে নিয়ে চলতে হলে তাদের ভাষা, তাদের মতকে গুরুত্ব দেওয়াও জরুরি। সরকার আবার নতুন করে ভাবতে বসল, কীভাবে আলাদা আলাদা রাজ্য তৈরি করা যায়। শেষমেশ ১৯৫৬ সালে সংসদে আইন পাশ করা হল। আইনে বলা হল যে এক একটা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষা অনুযায়ী রাজ্য হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের মতো তৈরি হল বেশ কয়েকটা ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য। তবে একই ভাষার মানুষকে এক রাজ্যে রাখা হল আর সব সমস্যাও সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল, অতই কি আর সহজ! সুযোগসুবিধে আর ক্ষমতা কে বেশি পেল আর কার ভাগে পড়ল কম – এই গোলমাল কি আর ভাষার বাঁধন দিয়ে আটকে রাখা যায় সবসময়? এক ভাষার রাজ্যেও নানা সমস্যা লেগেই থাকে। অন্য কতরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য আলাদা করার দাবি ওঠে তখন। তাই তো তেলুগু ভাষার মানুষের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ এই কয়েক বছর আগে ২০১৪ সালে

ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি হল আলাদা তেলেঙ্গানা রাজ্য। রাজ্য ভাগ হওয়া, নতুন রাজ্য তৈরি হওয়া কিন্তু আজও হয়ে চলেছে।

তবে রাজ্য ভাগ হল বলে এক রাজ্যের মানুষের অন্য রাজ্যে যাওয়া বা থাকা বারণ হল, তা নয় কিন্তু! শুরুতেই বলছিলাম, আমরা সবাই চাইলেই যেতে পারি যে কোনও রাজ্যে, থাকতেও পারি সেখানে। দেশের সকলের সেই অধিকার আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক রাজ্যেই পাশাপাশি থাকা দুই ভাষার মানুষের মধ্যে লাগে মহা গোলমাল। এক ভাষার কিছু লোক বলেন যে এ রাজ্য কেবল আমাদের, বাকিদের তাড়াও। আসলে, কেবল 'আমার ভাষা বনাম তোমার ভাষা'—এ রকম সহজ তো নয় হিসেবটা। আসল লড়াইটা বাঁধে একটা রাজ্যের চাকরি-বাকরি, জমিজমা, সম্পত্তি, আরও অন্য সব সুযোগ-সুবিধে কে পেল আর কে পেল না, তাই নিয়ে। এক ভাষার মানুষ যদি বাকিদের থেকে এগুলোয় একটু ভাগ বেশি পায়, তাঁদের তখন ক্ষমতাও হয় বেশি। আবার যাঁদের ক্ষমতা বেশি, তাঁরা অনেকসময়ই বাকিদের একটু খাটো ভাবে, নিচু চোখে দেখে। সেও তো ভারী অপমানের ব্যাপার! এই সব সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা, মানসম্মানের লড়াইগুলো প্রায়ই ভাষার নাম করে হানাহানির রূপ নেয়। স্বাধীন ভারতের নানা জায়গায় নানা সময়ে এমন হানাহানি বেঁধেছে। সেই সব ইতিহাস পুরো বলতে গেলে এত কথা বলতে হবে যে, এই বইতে ধরানোই যাবে না। ঘরের কাছের একটা

উদাহরণ দিই বরং। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমেই যেমন অসমীয়া আর বাংলা, এই দুই ভাষার মানুষের মধ্যে অনেক বছর ধরে চাপা রেষারেষি রয়েছে, মাঝে মাঝেই তা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। এই রেষারেষির ইতিহাসটাই একটু খুলে বলি, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ভাষার লড়াইয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকে কত পাওয়া না-পাওয়ার জটিল হিসেব। অসমীয়া-বাঙালির গোলমালের শুরুটা লুকিয়ে রয়েছে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে। বুঝতে হলে তাই আবার ফিরতে হবে সেই সময়টায়।

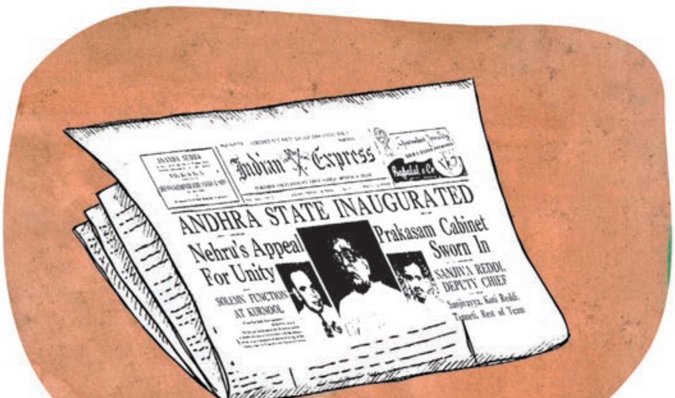

(খ) অসমের ভাষার লড়াই

অসমের ভাষার লড়াইয়ের ইতিহাস বেশ লম্বা। সেই ইংরেজ আমলের শুরু থেকেই ভাষা নিয়ে নানা চাপানউতোর চলেছে। বাংলা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন অসমীয়ারা। আবার একটা সময়ের পরে অসমীয়া জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়েছেন বাঙালিরা। এক ভাষা এক সময় বেশি শক্তিশালী হয়েছে, সময়ের ফেরে পরে সেই ভাষাই হয়েছে কোণঠাসা। শুরু থেকেই শুরু করি তাহলে। এখন যে অসম রাজ্য, সেখানে অনেক মানুষের ভাষা অসমীয়া। তবে অসমীয়া বাদেও এখানে বাঙালি, বোড়ো, কারবি, ডিমাসা এরকম আরও অনেক ভাষার মানুষ থাকেন। অনেক বাঙালি অসমে বহু দিন ধরে আছেন। আসলে বাংলা আর অসমের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে একে অপরের সঙ্গে।

১৮২৬ নাগাদ অসম দখল করেছিলেন ইংরেজরা। তত দিনে বাংলায় তাঁরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন, কিন্তু পূর্ব দিকে আর বিশেষ এগোতে পারেননি। শেষ অবধি অসম কব্জা করা গেল। নতুন জায়গার মানুষদের ভাষা শিখিয়ে, কাজ শিখিয়ে চাকরি-বাকরি দিতে গেলে তো অনেক দিন সময় লেগে যাবে। অত দিন কি আর শাসনের কাজ ফেলে রাখা যায়! আর ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অসমের পাহাড়গুলোতে চা বাগান খোলা, চায়ের ব্যবসা করা। ব্যবসা চালাতেও কেরানি, খাজাঞ্চি, কুলি, পাইক-পেয়াদা চাই। ইতিমধ্যে বাঙালিরা

তো ইংরেজি শিখে, ব্রিটিশদের চাকরি-বাকরি করে অনেকটাই সড়গড় হয়ে উঠেছে। তাই লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে শাসকরা ঠিক করল আপাতত বাঙালিদের দিয়েই অসমের কাজকর্ম চালানো যাক। নতুন দখল করা জায়গা তারা ঢুকিয়ে নিল বাংলা প্রদেশের মধ্যে। অসমে নতুন আপিস-কাছারি যা খোলা হল, সেখানে অনেক বাঙালিকে চাকরি দেওয়া হল। তাই সেই সময় থেকেই বাঙালিরা এসে থাকা শুরু করলেন অসমে। সেখানকার মানুষ কোন ভাষায় কথা বলেন, সে সব তোয়াক্কা না করে বাংলা ভাষাও চালু করে দিল ইংরেজ শাসক। বলা হল যে লেখাপড়া আর কাজের জায়গার ভাষা হবে বাংলা। অসমীয়া যে আলাদা ভাষা, এই সময় সরকার তাও মানতে চায়নি। অসমের মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন তা আসলে বাংলারই এক রকমফের—এমনটাই বলত তারা।

একটা কথা এখানে একটু বলে রাখি। বইয়ের গোড়ার দিকে বলেছিলাম যে মিশনারিদের হাত ধরে বাংলা ভাষার পরিবর্তন হয়েছিল ইংরেজ আমলের শুরু থেকেই। অসমেও এমনটাই হয়েছিল। একদিকে ইংরেজরা অসমকে বাংলা প্রদেশে এনে বাংলা চালু করে দিল। অন্যদিকে অসমে যে মিশনারিরা এসেছিলেন, তাঁরা দেখলেন যে অসমের মানুষের মুখের ভাষা আলাদা। তাঁরা ছাপাখানা খুলে অসমীয়া ভাষায় বই, পত্র-পত্রিকা ছাপা শুরু করলেন। আগে মানুষের মুখে মুখে আর প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যে এক রকম অসমীয়া চালু ছিল বটে। কিন্তু বানান, হরফ,

ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধা অসমীয়া ভাষা তৈরি হল ১৮৪০-৫০-এর দশক জুড়ে। অসমের শিক্ষিত মানুষেরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের ভাষাকে আরও শক্তপোক্ত করে তুলতে। অন্য যে কোনও ভাষার মতোই নিজেদের ভাষা নিয়ে তাঁদের খুব গর্ব। তাঁরাই ক্রমে বলা শুরু করলেন যে তাঁদের আলাদা ভাষা থাকা সত্ত্বেও কেন বাংলা চাপিয়ে দেওয়া হল অসমের উপর? প্রতিবাদ জোর পেতে লাগল, সমাজের অন্য মানুষও গলা মেলালেন।

১৮৭৪ সালে অসমকে বাংলা থেকে আলাদা করার দরকার পড়ল। এমনটা হল অবশ্য মূলত ব্যবসার খাতিরে। অসমের আশেপাশের পাহাড়ে থাকতেন অনেক আদিবাসী-উপজাতির মানুষ। কিছুতেই আর তাঁদের বাগে আনতে পারছিলেন না ব্রিটিশরা। তাই ঠিক হল যে এই অঞ্চলটাকে একটু আলাদা ভাবে আরও কড়া শাসনে আনতে হবে, যাতে আরও শক্তি দিয়ে পাহাড়গুলো দখল করা যায়। কড়া শাসনে বাঁধলে পরেই বেশি চা বাগান খোলা যাবে, নানা চাষবাস করে লাভ করা যাবে। ওই যে বলছিলাম, ব্রিটিশদের সময়ে প্রদেশ ভাগ করা, জোড়া লাগানো সবই হত তাঁদের ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক মেনে। তাই সেই হিসাব কষেই অসম হল আলাদা প্রদেশ। আর তার ঠিক আগেই, ১৮৭৩ সাল, অসমীয়াকে আলাদা ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল ইংরেজ সরকার।

আলাদা প্রদেশ হলে কী হবে, বাংলার থেকে একেবারে আলাদা হওয়া কিন্তু হল না। অসমে যে

অনেক বাঙালি— বিশেষ করে অসমের দক্ষিণের পাহাড়ের গায়ে সিলেট আর কাছাড় জেলায় অনেক মানুষের ভাষাই ছিল বাংলা। এই বাঙালিরা বলা শুরু করলেন যে তাঁদের জেলাকে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। অসমীয়াদের একটা বড় অংশও চাইছিলেন, এঁরা চলে যান বাংলায়। অসমে তা হলে বাঙালিদের দাপট কমে। কিন্তু চাইলে কী হবে? কে আর শুনছে এ সব দাবি? বারবার নানা হিসেব কষে সীমানা পালটানোর খেলা চালিয়েই গেল ইংরেজ সরকার। একটু আগেই বলছিলাম যে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হয়েছিল, আর পূর্ববাংলার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল অসম। সিলেট, কাছাড়ের বাঙালিদের তখন খুব আনন্দ— পূর্ব বাংলার সঙ্গে জুড়েছে যে! কিন্তু আবার যেই অসম আলাদা হল ১৯১১ সালে, সিলেট আর কাছাড় ফের এসে ঢুকল অসমে। বাঙালি-অসমীয়া ঝগড়া চলতেই থাকল।

১৯২০-র দশকে কিন্তু আর এক ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, বাংলার পূর্ব দিকে যত না চাষের জমি তার চেয়ে মানুষ অনেক বেশি, জমি আর কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। অন্যদিকে অসমে চাষবাসের ধরনধারণ আলাদা, সেখানে বাংলার মতো জমিদারের নামে জমি ভাগ হয়নি। অনেক জমি খালি পড়ে আছে। ইংরেজরা যথারীতি লাভের উপায় দেখলেন। খালি জমিতে চাষ হলে তবেই না আরও খাজনা আদায় করা যাবে। তাঁরা পূর্ববাংলার চাষিদের অসমের খালি জমিতে চাষ করতে ডেকে আনলেন। দলে দলে বাঙালি চাষি এলেন অসমে, এবং তাঁরা

থেকে গেলেন সেখানেই। চাষবাস করে ঘর বাঁধলেন নতুন জায়গায়। এঁরা বেশিরভাগই ছিলেন পূর্ববাংলার মুসলমান বাঙালি। তাঁরা ধীরে ধীরে অসমীয়া ভাষাও শিখে নিলেন। অনেক বছর থাকতে থাকতে তাঁরা নিজেদের অসমীয়া বলেই পরিচয় দেওয়া শুরু করলেন। কিন্তু তাহলেও তাঁরা যে আসলে বাংলা থেকে এসেছিলেন, এ কথা তো আর সবাই ভুলে গেল না। বরং অনেক অসমীয়ার মনে হল যে শিক্ষিত বাঙালিরা মাইনে করা চাকরি তো নিয়েই নিয়েছে, এখন বাঙালি চাষি তাঁদের প্রদেশের জমিও দখল করতে হাজির। তাই অসমের অসমীয়া আর বাংলা থেকে আসা অসমীয়া, এরকম একটা ভাগ ভিতরে ভিতরে থেকে গেল। আজও এই দু'দলের মধ্যে প্রায়ই গোলমাল বাঁধে।

দেশভাগের সময় অসমের দক্ষিণ দিকে সিলেটের বেশির ভাগ অঞ্চলই চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। গোটা কাছাড় আর সিলেটের একটা ছোট্ট অংশ থাকল বরাক উপত্যকায়। স্বাধীনতার পরে দেখা গেল যে অসমের অন্য সব জেলায় অসমীয়া ভাষার মানুষের সংখ্যা অনেক। কেবল দক্ষিণে বরাক উপত্যকায় প্রায় সকলে বাঙালি। স্বাধীনতার পর অনেক জায়গায় ভাষা অনুযায়ী রাজ্য তৈরি হচ্ছে। তেমন এক সময়ে অসম রাজ্যের সরকার ঠিক করল, অসমীয়াই হবে সেই রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা। ১৯৬১ সালে এরকম ঘোষণা করা মাত্র বরাক উপত্যকার শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির বাঙালিরা শুরু করলেন আন্দোলন।

কিছুতেই তাঁরা মেনে নেবেন না তাঁদের উপর অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার সরকারি নীতি। শুরু হল হরতাল, পদযাত্রা। ১৯৬১ সালের ১৯ মে সকাল থেকে জমায়েত শুরু হল শিলচর রেল স্টেশনে। অসম সরকারের পুলিশও হাজির। জোর লড়াই বাঁধল দু'পক্ষের। ১১ জন প্রাণ হারালেন সেদিন পুলিশের গুলিতে। অসম সরকার পিছিয়ে এল। স্থির হল যে, গোটা অসমে অসমীয়া ভাষা থাকবে, কেবল বরাক উপত্যকায় থাকবে বাংলা ভাষা। অনেকেই ভুলে যান যে, অসমে রক্তঝরা ভাষার লড়াইয়ের পিছনে আসলে বহু দিনের নানা হিসেবনিকেশ লুকিয়ে আছে, আর রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের লাভ-ক্ষতির ফর্দ। ইতিহাস পড়লেই অবশ্য বোঝা যায় এই লড়াইয়ের নানা জটিলতা। দেখা যায় দু'দলের ঝুলিতেই জমা হয়েছে অনেক অভাব-অভিযোগ, অপমানের কিসসা।

অসম-বাংলার লড়াই নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা চারিদিকে শুনি। সেই লড়াই চলছেও তো কত বছর হল। কিন্তু অসমে এই দুটো ভাষা ছাড়াও আরও অনেক ভাষার মানুষ থাকেন। এইসব ভাষার আমরা খোঁজই বা রাখি কতটুকু! তাঁরা অনেকেই কিন্তু তাঁদের ভাষা টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন রোজ। তাঁদের অভিযোগ, অসমে সকলের উপর কেবলই অসমীয়া চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, অন্য ভাষার মর্যাদা নেই। এমন চললে তাঁদের ভাষাগুলো নির্ঘাত হারিয়ে যাবে। অসমের উত্তর দিকে বোড়ো উপজাতির মানুষেরা নিজেদের

ভাষার জন্য লড়াই করেছেন অনেক দিন। শেষমেশ ২০০৪ সালে দেশের ভাষার তালিকায় জায়গা পেয়েছে এই ভাষা। অসমের সরকারও তাঁদের ভাষাকে মেনে নিয়েছে। স্কুলে বোড়ো ভাষায় লেখাপড়া করা যাবে, সরকারি কাগজপত্রে এই ভাষা চলবে। কিন্তু অন্য আরও অনেক ভাষার টিকে থাকার লড়াই চলছে প্রতিদিন। কেবল অসমেই নয়, সারা দেশেই মাত্র কয়েকটা শক্তিশালী ভাষা ইতিহাসে একটু বেশি জায়গা পেয়েছে, তাদের লড়াইয়ের গল্প আমরা বেশি জানতে পারি।

১৭৬৫	বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার খাজনা আদায়ের অধিকার পেল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই অঞ্চলটাই হল বাংলা প্রদেশ।
১৮২৬	অসম জয় করল কোম্পানি, এই নতুন এলাকা এসে ঢুকল বাংলা প্রদেশে।
১৮৭৪	অসমকে বাংলা থেকে আলাদা করা হল, তৈরি হল আলাদা অসম প্রদেশ।
১৯০৫	বাংলা ভাগ হল। পূর্ব বাংলার অনেকগুলো জেলাকে অসম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তৈরি হল পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশ। বাংলা বিহার উড়িষ্যার বাকি অংশটা রইল বাংলা প্রদেশে।
১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ হল। আবার আগের মতো বাংলা প্রদেশ জুড়ে গেল, অসম হল আলাদা।
১৯৪৭	দেশ স্বাধীন হল, সেই সঙ্গে দেশ ভাগও হল। ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা দেশ তৈরি হল। বাংলার পূর্বের অঞ্চলটা হল পাকিস্তানের অংশ।
১৯৭১	পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার মানুষেরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে তৈরি করলেন নতুন দেশ – বাংলাদেশ

৫। দেশ সকলের, তবু কেউ বাদ পড়ে কি?

সব মানুষই নিজের নিজের পরিচয় নিয়ে বড় হয়। সকলের ভাষা, সকলের ধর্ম পাশাপাশি একসঙ্গে থাকতেই পারে, তাতে তো কারও কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যেই এক ভাষা অন্য ভাষার উপর খরবদারি করতে যায়, তখনই বেঁধে যায় গোলমাল। যে ভাষার মানুষের ক্ষমতা বেশি, তাঁরা বাকিদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা শুরু করে, যাতে নিজেদের ক্ষমতা টিকে থাকে। তাই তো দেখলাম যে বঙ্গভঙ্গের সময় শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি বাকিদের থেকে ক্ষমতায় উপরে, তাই তাঁদের দাবি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জোরও ছিল বেশি। ইংরেজ শক্তিও হার মেনেছিল। একই ভাবে, দেশভাগ হওয়ামাত্র যেই পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা এল, উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তাঁরা। অসমকে যখন বাংলায় আনা হল, বাংলা চাপানো হল অসমীয়াদের উপরে। অনেক পরে যখন অসম আলাদা রাজ্য হল, তখন সেই একই কাণ্ড করল অসমের সরকার। বাঙালিরা সংখ্যায় কম, তাই অসমীয়া ভাষা চাপানো হল বাঙালির উপর। এই ভাবে ক্ষমতার ওঠানামাও চলতে থাকে, আর ভাষার লড়াইয়ের ইতিহাসও নতুন নতুন বাঁক নেয়।

একদিকে আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা পরিচয়ের সীমানা। অন্যদিকে রাষ্ট্র কেবলই আমাদের মনে করায় যে তোমরা সবাই কিন্তু ভারতীয়, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। সহজ

বুদ্ধিতে কী মনে হয়? একই দেশে থাকি বলে আমরা সকলে সমান, পরিচয় আমাদের যাই হোক না কেন। কিন্তু কিছুতেই যে সমান হতে পারি না সকলে। যে ভাষার দাপট বেশি, সে কেবলই গিলে খেতে চায় ছোট ভাষাদের। এই যেমন মাঝেই মাঝেই হুঙ্কার দেয় আমাদের দেশের সরকার—সবাই ভারতীয়, এটা বোঝানোর জন্য একটা ভারতীয় ভাষার খুব দরকার। দেশের রাজনীতিতে হিন্দি ভাষার মানুষের ক্ষমতা বেশি। তাঁরা সুযোগ বুঝে বলেন যে হিন্দিই হোক দেশের ভাষা, জাতীয় ভাষা। কিন্তু দেশের সকলে তো আর হিন্দি জানেন না। ঠিক যেমন হিন্দি ভাষার মানুষেরাও অন্যদের ভাষা জানেন না। তাই কেবল বেশি ক্ষমতার বলে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইলে বাকিরা মানবে কেন? বাকিদের ভাষা তো আর কম ভারতীয় নয়। এই নিয়ে মাঝে মাঝেই খুব শোরগোল পড়ে।

আর দেশে কি এক রকম হিন্দি? কত এলাকার মানুষ যে কত ধরনের হিন্দি বলেন! অথচ যে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা বলে চাপিয়ে দেওয়ার এত চেষ্টা, সেটা আসলে এক রকম জোর করে তৈরি করা ভাষা। এই হিন্দি কেবলই নিজেকে হিন্দুর সঙ্গে জুড়ে নিতে চায়। উত্তর ভারতে 'হিন্দুস্তানি' ছিল মানুষের মুখে মুখে ফেরা হিন্দি-উর্দুর মিশেল এক ভাষা। হিন্দু-মুসলমান বহুদিন মিলেমিশে থাকার ফসল ছিল এই ভাষা। কিন্তু বিশ শতক থেকেই ধর্মের গোঁড়ামি ঢুকে পড়ে জটিল করে তুলেছিল ভাষার গল্পকে। বেশ কিছু গোঁড়া হিন্দু ভাষাবিদ চেষ্টা শুরু করলেন উর্দু শব্দ বাদ দিয়ে, বেশি বেশি সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে আলাদা হিন্দি ভাষা তৈরির।

এই ভাষাকে তারপর জুড়ে দেওয়া হল হিন্দুর পরিচয়ের সঙ্গে। এতদিন হিন্দুস্তানি অনায়াসেই সকলে লিখতেন দেবনাগরী বা উর্দু হরফে। কিন্তু এখন বলা হল হিন্দুদের ভাষা হিন্দি, যা লিখতে হবে দেবনাগরী হরফে, আর উর্দু হল মুসলমানের ভাষা এবং হরফ। দেশভাগের সময় ভাষা আর হরফ নিয়ে ধর্মের ভেদাভেদ আরও জোরালো হল। পাকিস্তানেও তখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার লড়াই চলছে। পাকিস্তান, মুসলমান আর উর্দু কেমন মিলেমিশে গেল কিছু মানুষের কল্পনায়। আর তাঁরা খুব চেষ্টা শুরু করলেন উর্দু বাদ দেওয়া হিন্দিকে কেমন করে করা যায় ভারতের ভাষা। অনেক দিন ধরে চলেছে সেই চেষ্টা। কিন্তু কোনও একটা 'জাতীয় ভাষা' বা 'দেশের ভাষা' এখনও চালু করা যায়নি। হিন্দি আর ইংরিজি এদেশের সরকারি ভাষা হয়ে রয়েছে অনেক দিন ধরেই।

ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে মোট ২২টি ভাষার উল্লেখ আছে, যেগুলি বিভিন্ন প্রদেশের সরকারি ভাষা। জাতীয় ভাষা বলে কিন্তু কিছু নেই। আর, কোনও ভাষার গায়ে 'জাতীয় ভাষা'-র তকমা এঁটে দিলেই কি তা দেশের সকলের হয়ে যায়? দেশ, জাতি, দেশের জন্য গর্ব— এই ধারণাগুলো আমাদের ছোট থেকে শেখানো হয়। আমাদের রপ্ত করতে হয় কীভাবে এই শব্দগুলোকে মানতে হবে। আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়। জাতীয় সঙ্গীত শুনলেই আমরা উঠে দাঁড়াই, জাতীয় পতাকা দেখলেই সম্মান করি। কিন্তু 'জাতীয়' বলে যা মানতে শিখছি, তার মধ্যে আমিও আছি তো, না কি আমি বাদ পড়ে গিয়েছি— এটা কিন্তু আমরা

সবাই ভাবি। অসমের মিসিং উপজাতির মানুষেরা অসমীয়া ভাষার সঙ্গে লড়াই করে চেষ্টা করছেন অসম রাজ্যে নিজেদের ভাষাকে টিকিয়ে রাখার। বাংলা-নেপালির ঝগড়ার খবরে চাপা পড়ে গিয়ে উত্তরবঙ্গের এক কোণে টোটো ভাষাও কোনও রকমে টিকে আছে। দেশের কোনও রেল স্টেশনে এই সব ভাষার দেখা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, গোটা দেশের একটাই ভাষা হওয়া উচিত, না কি উচিত নয়, এই ঝগড়ায় কি এঁরাও গলা মেলাতে পারেন? মোটেই তা পারেন না। সে এক্তিয়ার কেবল তামিল, বাংলা, মারাঠি, অসমীয়ার মতো ক্ষমতায় বড় অন্য ভাষাগুলির। তাহলে কোনটা দেশের, কোনটা জাতীয়, এসব কি আসলে ঠিক করে কিছু মানুষ? তাহলে, 'দেশের'—এই শব্দটার মানে কী? 'জাতীয়' কাকে বলে? যা সকলের, নাকি যা সকলকে মানতে হবে? এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু রাষ্ট্র কেবলই এড়িয়ে যায়।

শেষের কথা

তোমরা তোমরা নিশ্চই মনে মনে ভাবছ, এই বইতে যা যা লিখলাম সেসব আমি জানলাম কেমন করে! খুব জরুরি এই প্রশ্ন। ঠিকমতো লেখাপড়া, খোঁজখবর না করে বানিয়ে বানিয়ে যাহোক একটা কিছু লিখলেই তো আর ইতিহাস লেখা হয় না! তাই অনেক বই, পত্র-পত্রিকায় ছাপা ঐতিহাসিকদের লেখা, পুরনো খবরের কাগজ, সরকারি কাগজপত্র – এইসব পড়ে, বুঝে, তথ্য মিলিয়ে দেখে তবে এই বই লিখেছি। কিছু কিছু এমন লেখার কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি। বড় হয়ে তোমরা নিজেরাই পড়ে দেখতে পারো। বিপিন পালের আত্মজীবনী Memories of My Life and Times (1932) - এ তাঁর সিলেট থেকে কলকাতায় আসার গল্প পাবে। বঙ্গভঙ্গ আর তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে জানার জন্য পড়েছি সুমিত সরকারের লেখা বই The Swadeshi Movement in Bengal: 1903-1908 (1973)। পাকিস্তানের ভাষার রাজনীতি, বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার ইতিহাস নিয়ে তনভির ফজল লিখেছেন Religion and Language in the Formation of Nationhood in Pakistan and Bangladesh (1999)। ১৯৫০-এর দশকে সদ্য স্বাধীন ভারতে কিভাবে সংবিধান তৈরি হয়েছিল, কেমন করে ভাষাভিত্তিক রাজ্য তৈরি হয়েছিল এগুলো জানা যায় জ্ঞানেশ কুদাইশিয়ার লেখা A Republic in the Making: India in the 1950s (2017) বইটি পড়লে। লিসা মিচেলের Language, Emotion, and Politics in South India: The Making of a Mother Tongue (2009) পড়লে জানা যায়

তেলুগু ভাষার জন্য লড়াইয়ের কথা। অসমীয়া ভাষা তৈরি হওয়ার ইতিহাস পড়েছি বোধিসত্ত্ব করের ‘Tongue has no Bone’: Fixing the Assamese Language 1800-1930 (2008) লেখায়। আজকের ভারতে হিন্দি ভাষা কে জাতীয় ভাষা করে তোলা নিয়ে যে ঝগড়াঝাঁটি, তার অতীত ইতিহাস লিখেছেন অলোক রাই, তাঁর Hindi Nationalism (2001) বইয়ে।

এই বইটা লিখতে আমাকে অনেকে সাহায্য করেছেন। ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে লিখলে ভাল হয়, বলে দিয়েছেন। বিশেষ করে যাঁদের কথা বলতেই হবে, তাঁরা হলেন সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, মানবী মজুমদার, রাজর্ষি দাশগুপ্ত, অচিন চক্রবর্তী, সেমন্তী ঘোষ, কৃত্তিকা সেনগুপ্ত, বোধিসত্ত্ব কর, অমিতাভ গুপ্ত, শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পারমিতা চক্রবর্তী, মধুমিতা বসু, সাবির আহমেদ, প্রিয়ঙ্কর দে, উপনীতা মুখার্জি, সুপূর্ণা ব্যানার্জি, আরশি পারভিন গুপ্ত, রাইশা মাহমুদ, ঐশী দত্ত, রূপকথা, মোহর সেনগুপ্ত, অন্বেষা সেনগুপ্ত এবং তিস্তা দাস। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লেখক ও শিল্পী পরিচয়

এই বইটি লিখেছেন দেবারতি বাগচী। দেবারতি ম্যাক্স ওয়েবার ফোরাম ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, নিউ দিল্লীতে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

বইটির চিত্র-পরিকল্পনা, প্রচ্ছদ ও মানচিত্র তৈরি করেছেন ওয়াসিম হেলাল। ওয়াসিম পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার। নানা দেশী বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার সাথে ওয়াসিম বইএর ছবি, প্রচ্ছদ ও চিত্র-পরিকল্পনার কাজ করেন।

বইটির ছবি এঁকেছেন রঞ্জিত চিত্রকর ও সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর। তাঁরা বংশ পরম্পরায় পটশিল্পী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার নয়া গ্রাম থেকে কাজ করেন রঞ্জিত ও সিরাজ। পটশিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরাও মূলত হিন্দু দেব-দেবীর আখ্যান আঁকেন ও সেই নিয়ে গান বাঁধেন। তবে এখন তাঁরা নানা অন্য বিষয় নিয়েও পট তৈরি করছেন। পটচিত্র বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়ের ঐতিহ্যের প্রমাণ। পটশিল্পীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁরা মূলত হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁদের ছবি আঁকেন ও গান বাঁধেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের নিজস্ব সামাজিক আখ্যান অনুসারে তাঁরা হিন্দু দেবতা বিশ্বকর্মার বংশধর। এভাবে তাঁদের জীবনে ও কাজে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম মিলেমিশে রয়েছে।

The **Institute of Development Studies Kolkata (IDSK)** was set up in 2002 by the Government of West Bengal as an autonomous centre of excellence in social sciences. It is a society with an autonomous governing body with eminent scholars and Government's nominees. IDSK is recognized for its advanced academic research and informed policy advice in the areas of literacy, education, health, gender, employment, technology, communication, human sciences and economic development. The academic programmes at IDSK include MPhil (2006-2022) and PhD in social sciences and short training courses for research scholars. It offers state-of-the-art IT and library facilities to its students and research scholars. It is fully funded by the Government of West Bengal. IDSK has been recognized by the ICSSR under the category of "ICSSR Recognized Research Institutes".

The **Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)** is a German political foundation that is part of the democratic socialist movement. True to the legacy of its namesake Rosa Luxemburg (1871-1919), it stands in solidarity with the workers' and women's rights movements. the organization serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as research centre for social development. The RLS has close ties to the German party DIE LINKE. RLS provides political education and a centre for advanced social research in both Germany and throughout the world. RLS is one of six party-affiliated political foundations in Germany; it supports partners in over 80 countries striving for social justice, strengthening public participation, and social ecological development.

চোখ-কান খোলা রেখে ইতিহাস শেখা যায় কেমন করে? ইতিহাস-সচেতন হওয়া কাকে বলে? এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে 'ইতিহাসে হাতেখড়ি' সিরিজের কথা ভাবা। একেকটি বই একেকটি বিষয় নিয়ে। লেখার সঙ্গে থাকছে পটচিত্র শিল্পীদের আঁকা ছবি। ইতিহাসের নানা সময়, নানা জটিল ধারণা সহজভাবে বুঝিয়ে বলাই এই বইগুলোর উদ্দেশ্য। বইগুলো পড়ে ছোটরা প্রশ্ন করতে শিখবে - এমনটাই আমাদের আশা।

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
SOUTH ASIA